সু-শাসন এবং ট্রিপল ওয়ানের সরকার

কাজী জহিরুল ইসলাম

ট্রিপল ওয়ানের সরকার আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে। তারা দূর্নীতির পুকুরে জাল ফেলে অনেক বড় বড় রুই কাতলা ধরেছেন এবং এখনো ধরছেন। আমরা এক বুক আশা নিয়ে অভিজ্ঞতার আলোয় উদ্ভাসিত তাদের উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, এবার দেশে সু-শাসন ফিরে আসবে। তারাতো আর মায়ে তাড়ানো, বাপে খেদানো তথাকথিত রাজনীতিবিদ নন। তারা সুশীল সমাজের প্রতিনিধি। শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণীজন। তারা দক্ষ, অভিজ্ঞ। এখন যদি দেশে সু-শাসন ফিরে না আসে, আর কবে আসবে? আমরা আশা করছি খুব সহসাই আর সোনার বাংলায় দূর্নীতি মাথাচারা দিয়ে উঠতে পারবে না। গত ১৫ বছরের সকল প্রধানমন্ত্রী এবং সকল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অনেক বড় বড় নামী-দামী রাজনীতিবিদ এখন দূর্নীতির দায়ে কারাগারে। তাদের বিচার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে অনেকের সাজাও হয়ে গেছে। এইসব দেখে আমরা আস্থা রাখতে পারি, তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পেশাগত প্রয়োজনে দেশের বাইরে থাকলেও, সারাক্ষণ কান পেতে রাখি দেশ থেকে কোন শুভ সংবাদ শোনার জন্য। বন্ধুদের মুখে শুনি দেশের অবস্থা এখন অনেক ভালো। অফিস-আদালতে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। ঘুষের জন্য ফাইল আর লাল ফিতায় বাঁধা পড়ে থাকছে না। সাম্প্রতিককালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সংঘটিত অসন্তোষকে কেন্দ্র করে সরকার যখন সান্ধ্য আইন জারী করেন তখন আমাকে বিদেশী সহকর্মীদের প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হতে হয়। শ্রীলংকান বন্ধু, আমাদের ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান, শান্তিলাল বলেন, হচ্ছেটা কি ওখানে? মিলিটারী কি এসে গেল? আমি বলি, না, এটা একটা অতি সাময়িক ব্যাপার। দু'চারদিনেই ঠিক হয়ে যাবে। হলোও তাই। আমাদের সেনাপ্রধান বলেছেন, 'কুমুদিনী (আসলে হবে কাদম্বিনী) মরিয়াই প্রমাণ করিল, সে মরে নাই'। আমরা এই কথা বিশ্ববাসীকে জানিয়েছি। বলেছি, আমাদের সেনাপ্রধান একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। তিনি যা করছেন সুশীল সরকারকে সহযোগীতা করার জন্যই করছেন। তার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

গত জুলাই মাসের শেষের দিকে এক মাসের ছুটিতে দেশে যাই। নিজের চোখে দেখার চেষ্টা করি আসলে কতখানি পরিবর্তন হয়েছে। ট্রিপল ওয়ানের আগে যখন লোকেরা বলতো জিনিসপত্রে হাত দেওয়া যায় না, বাজারে আগুন। আমার গায়ে সেই আগুন লাগতো না। কারণ আমি জাতিসংঘে কাজ করি। ডলারে বেতন পাই। অনেক দিন ধরে বিদেশে থাকি বলে কোন কিছু কিনতে গেলে বিদেশের দামের সঙ্গে তুলনা করে মনে হতো ঠিকই আছে। এমন বেশিতো না। কিন্তু এবার বাজারে গিয়ে আমার নিজের কাছেই মনে হলো, বাজারে সত্যিই আগুন। এই আগুনে আমার মতো ডলারে বেতন পাওয়া লোকেরাও পুড়ে যাচ্ছে। এই আগুনকে আর বেশি বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। আগুন দ্রুত নেভাতে হবে। নইলে এই আগুনে সরকারও পুড়ে মরতে পারে। বুঝতে পারছি তথাকথিত আমদানীকারকসহ অনেক ব্যবসায়ীই কাজকর্ম বন্ধ করে ঘাপটি মেরে আছে। এর প্রভাব পড়ছে বাজারে। এই সঙ্কট যেন সাময়িক সঙ্কট হয়, যেন প্রলম্বিত না হয়, সেজন্য সরকারকে দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। নতুন বিজনেস কমিউনিটি তৈরী করতে হবে। সৎ ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করতে হবে।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দু'একটি সরকারী অফিসেও যেতে হয়েছে। আগের সেই স্থবিরতা কিছুটা কমেছে একথা সত্যি, তবে ঘুষের বিষয়টি এখনো দূর হয় নি। উত্তরার রাজউক অফিসে আমার একটি কাজ ছিল। কাজের জন্য যাকে পাঠিয়েছি, তিনি ১৯ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে কাজটি করিয়ে এনেছেন। আয়কর অফিসে গেলাম রিটার্ণ জমা দিতে। অফিসের একজন সহকারী হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছেন। 'ইম্যুনিটি এন্ড প্রিভিলেজ এ্যক্ট ১৯৪৭' এর আওতায় জাতিসংঘে কর্মরত কর্মচারী/কর্মকর্তাদের আয় করমুক্ত। এজন্য করমুক্ত কারণ, আমাদের বেতন থেকে আয়কর কেটে নিয়ে আমাদেরকে নেট বেতন প্রদান করা হয়। এই করের পরিমান খুবই বেশি। জাতিসংঘের ছয়টি সদর দফতর যেসব দেশে অবস্থিত সেইসব দেশের প্রচলিত আয়করের গড় করে এই হার নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইতালী এবং কেনিয়া। একজন মধ্যম পর্যায়ের আন্তর্জাতিক কর্মকর্তার বেতন থেকে প্রতি মাসে বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার মতো আয়কর হিশেবে (জাতিসংঘের ভাষায় স্টাফ এসেসমেন্ট) কেটে নেওয়া হয়। এই কথা আমি ওদেরকে বুঝিয়ে বললাম। ওরা বুঝলেন। আমি খুশি হয়ে আয়কর রিটার্ণ জমা দিয়ে চলে এলাম।

ষোলই সেপ্টেম্বর রাতে আমার স্ত্রীর টেলিফোন পাই। তিনি খুবই উদ্বিগ্ন। আমি বলি কি হয়েছে? 'শোন, জিনাত আরা নামক একজন উপকরকমিশনার তোমার নামে চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিটি আজই এসেছে। তিনি বলেছেন, আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর সকালে তোমাকে তার অফিসে হাজির হতে হবে। সাথে করে একটি তালিকা নিয়ে যেতে হবে, যে তালিকা জাতিসংঘ বাংলাদেশ সরকারকে এই মর্মে দিয়েছে যে এই লোকগুলোর আয়ের ওপর কোন করারোপ করা যাবে না। এবং সেখানে তোমার নাম থাকতে হবে।' এমন কোন তালিকার কথা আমি জানি না। আমি শুধু জানি, 'ইম্যুনিটি এন্ড প্রিভিলেজ এ্যক্ট' যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় তখন ২টি দেশ এতে সই করে নি। সেই দুটি দেশ হলো মার্কিন যুক্তরাস্ট্র এবং মেক্সিকো। এই দুই রাষ্ট্রের নাগরিক যখন জাতিসংঘে কাজ করে তখন তাদের আয়ের ওপর তাদেরকে কর দিতে হয়। সেই কর জাতিসংঘই দিয়ে দেয়। কারণ স্টাফ মেম্বারের বেতন থেকেতো জাতিসংঘ আগেই কর কেটে রাখে। বাংলাদেশ যেহেতু অন্য অনেক দেশের মতোই এই আইন সই করেছে কাজেই বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের কাছে আমার আয়ের ওপর কোন কর ফেরত চাইতে পারবে না। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি এইটুকু বুঝি, বাংলাদেশের আয়কর অফিসের কাছে আমাকে এটা প্রমাণ করতে হবে যে, আমি জাতিসংঘের একজন কর্মী। সেই প্রমাণ আমি তাদেরকে দিয়েছি। আমাদের মিশনের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আমার আয়ের বিবরণী তার অফিসের প্যাডে লিখে দিয়েছেন এবং তিনি জাতিসংঘের সীলমোহরের ওপর স্বাক্ষর করেছেন। আমার মনে আছে, আয়কর অফিসের সেই বিশেষ সহকারীটি আমাকে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলছিলেন, 'হাজার পঞ্চাশেক ধরে দিই ?'

যাই হোক, পরদিন সকালে নানান দপ্তরে ছোটাছুটি করে বেশ কিছু কাগজ-পত্র জোগাড় করে জনাবা জিনাত আরাকে একটি উত্তরপত্র লিখি। আমার স্ত্রীকে অনুরোধ করি, আমার পক্ষ থেকে তুমি ১৮ তারিখ সকালে তার অফিসে গিয়ে দেখা কর। আমার স্ত্রী বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে ছুটতে ছুটতে যথাসময়ে কাকরাইলে, তার অফিসে, গিয়ে হাজির হন। কিন্তু সেখানে গিয়ে শোনেন, তিনি আজ অফিসে আসবেন না। হায়রে সুশাসন! একজন ক্লায়েন্টকে হাজিরা দেওয়ার তারিখ দিয়ে তিনি নিজেই অনুপস্থিত। আমার স্ত্রী সারারাত ঘুমাতে পারেন না। কি-না কি হয়? যেহেতু আমরা কখনোই আইন ভঙ্গ করি না, একটি সরকারী নির্দেশ পালন করতে না পারার কারণে তার অন্তহীন টেনশন। পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় টেলিফোন করে জানা গেল তিনি এইমাত্র অফিসে এসেছেন, এখনো চিঠিটি দেখেন নি।

আমি আশা করবো এই ঘটনাগুলো অতি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এর সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান সামগ্রীক অবস্থার কোন মিল নেই। সেই সঙ্গে এই প্রত্যাশাও করছি, পরের বার ঢাকায় গিয়ে এমন ‘অতি বিচ্ছিন্ন’ ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে না।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

লেখক: কবি, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পেশাজীবী